ইউনিট ৩
গৃহপালিত পশুর
ব্যাকটেরিয়াজনিত
সংক্রামক রোগ

ইউনিট ৩ গৃহপালিত পশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ

গৃহপালিত পশুর বিভিন্ন সংক্রামক রোগের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ (Bacterial Diseases) অন্যতম। ব্যাকটেরিয়া অতি ক্ষুদ্র এককোষী অণুবীক্ষণিক জীবাণু। গঠন অনুযায়ী এরা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন– গোলাকার বা কক্কাস (Coccus), দন্ডাকৃতির বা ব্যাসিলাস (Bacillus), বাঁকা দন্ডাকৃতির বা কমা আকৃতির অর্থাৎ ভিব্রিওস (Vibrios), প্যাঁচানো বা স্পাইরোকিটস (Spirochaetes) ইত্যাদি। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরে সুতার মতো ফ্লাজেলা (Flagella) বা পিলাই (Pili) থাকে। ব্যাকটেরিয়া মানুষসহ বিভিন্ন পশুপাখির দেহে আশ্রয় নিয়ে জীবনধারণ করে এবং আশ্রয়দাতা বা পোষকের দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। গবাদিপশু বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এতে এদের উৎপাদন কমে যায়। অনেক সময় মারাও যায়। ফলে কৃষক বা খামারি তথা দেশের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের গৃহপালিত পশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মধ্যে বাদলা, গলাফোলা, তড়কা, কলিব্যাসিলোসিস, সালমোনেলোসিস, ম্যাস্টাইটিস, যক্ষ্মা, ফুট-রট, এন্টারোটক্সিমিয়া, ধনুষ্টংকার, জোনস্ ডিজিজ ইত্যাদি প্রধান। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে পারলে অনেক রোগই ভালো হয়ে যায়। তবে, কৃষকের গোয়ালে বা খামারে যেখানে পশুপালন করা হয় সেখানে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রক্ষা করলে, পশুকে পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান করলে এবং নির্ধারিত সময়ে টিকা প্রদান করলে এদের বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা যায়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বাছুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, গবাদিপশুর বাদলা, গলাফোলা এবং তড়কা রোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১ বাছুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাছুরের বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগের নাম বলতে পারবেন।
- বাছুরের নাভেল ইল বা জয়েন্ট ইল রোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাছুরের ডিপথেরিয়া রোগ ও তার প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবেন।

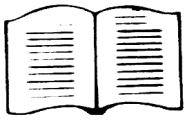

বাছুরের বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া-জনিত রোগের মধ্যে সালমোনেলোসিস, নাভেল ইল, বাদলা, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি উলে-খযোগ্য।

বাছুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

বাছুর বহু ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে, সবগুলো রোগই বাছুরের মৃত্যুর কারণ হয় না। কিন্তু, কিছু কিছু রোগে যে কোনো বয়স এবং জাতের বাছুর আক্রান্ত হতে পারে যা বাছুরের মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। বাছুরের বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মধ্যে কলিব্যাসিলোসিস বা সাদা পায়খানা, সালমোনেলোসিস, নাভেল ইল বা জয়েন্ট ইল, বাদলা, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কলিব্যাসিলোসিস ও সালমোনেলোসিস অল্প বয়স্ক বাছুরের এবং বাদলা বড় বাছুরের প্রাণসংহারী রোগ। এ রোগগুলো তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, কলিব্যাসিলোসিস ও সালমোনেলোসিস সম্পর্কে পাঠ ৬.৩ এবং বাদলা রোগ সম্পর্কে পাঠ ৩.২ এ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এ পাঠে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো না। এ পাঠে শুধু নাভেল ইল ও বাছুরের ডিপথেরিয়া রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নাভেল ইল বা জয়েন্ট ইল (Navel Ill/Joint Ill)

নাভেল ইল রোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমে নাভিতে ও পরে শরীরের বিভিন্ন সন্ধিতে প্রদাহের সৃষ্টি হবে।

এটি বাছুরের একটি সংক্রামক রোগ। এ রোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমে নাভিতে (Navel) প্রদাহ (Inflammation) হবে এবং পরে শরীরের বিভিন্ন সন্ধি বা জয়েন্টে, বিশেষ করে পায়ের সন্ধিগুলোতে, প্রদাহের সৃষ্টি হবে। এ রোগ এদেশে বিক্ষিপ্ত আকারে দেখা যায়। এতে কোনো মড়ক লাগে না। নবজাত বাচ্চা জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই আক্রান্ত হতে পারে। গরুমহিষের বাছুর ছাড়াও ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগলের বচ্চা এতে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের কারণ

বেশ কয়েক প্রকারের ব্যাকটেরিয়ার কারণে এ রোগ হতে পারে। তবে, বাছুর প্রধানত *Streptococcus pyogenes (স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনিস)* দ্বারা আক্রান্ত হয়। এছাড়াও এ রোগের জন্য দায়ী অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াগুলো হচ্ছে *Streptococcus genitalium (স্ট্রেপটোকক্কাস জেনিটালিয়াম)*, *Escherichia coli (ইস্কেরিশিয়া কলাই)*, *Corynebacterium pyogenes (করাইনেব্যাকটেরিয়াম পায়োজেনিস)*, *Spherophorus necrophorus (স্ফেরোফোরাস নেক্রোফোরাস)* প্রভৃতি।

রোগ সংক্রমণ

গাভীর জরায়ুর নিঃসরণ দ্বারা কলুষিত পরিবেশ থেকে রোগজীবাণু বাছুরের ভেজা নাভি বা নাভির ক্ষত দিয়ে সহজেই দেহে প্রবেশ করে।

রোগের বিকাশ

নাভেল ইল রোগের জীবাণু নাভিপ্রদাহ এবং ব্যাকটেরিমিয়ার সৃষ্টি করে।

নাভিতে প্রবেশের পর জীবাণু সেখানে বংশবৃদ্ধি করে ও নাভিপ্রদাহ বা ও ওমফ্যালাইটিসের (Omphalitis) সৃষ্টি করে। এরপর জীবাণু রক্তে মিশে ব্যাকটেরিমিয়ার (Bacterimia) সৃষ্টি করে। বাচ্চার বয়স এক সপ্তাহের কম হলে সেপ্টিসেমিয়া (Septicemia) হয়ে মারা যেতে পারে। কিন্তু, বাচ্চা বেঁচে থাকলে এবং রোগ কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে জীবাণু শরীরের বিভিন্ন সন্ধিতে গিয়ে সন্ধিপ্রদাহের (Arthritis) সৃষ্টি করে। এমনকী এগুলো মস্তিষ্কে গিয়ে মেনিনজাইটিস (Meningitis) এবং হৃৎপিন্ডে গিয়ে এন্ডোকার্ডাইটিসের (Endocarditis) সৃষ্টি করতে পারে।

রোগলক্ষণ

আক্রান্ত বাছুরে নিম্নলিখিত রোগলক্ষণ দেখা যায়। যেমন–

- নাভি ফুলে যায়।
- নাভিতে ব্যাথা হয় ও তাতে পুঁজ জমে। বাছুর নাভি চাটলে তা জটিল আকার ধারণ করতে পারে।
- জ্বর হতে পারে।
- ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
- সন্ধিপ্রদাহ হলে বিভিন্ন পায়ের এক বা একাধিক সন্ধি বা গিট ফুলে যায়। বাছুর খুঁড়িয়ে হাঁটে অথবা ব্যাথায় হাঁটতে পারে না।

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ এবং নাভি বা অস্থিসন্ধির ক্ষত থেকে নমুনা সংগ্রহ করে জীবাণু শণাক্ত করে রোগ নির্ণয় করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন–

- রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ পরীক্ষা করে।
- আক্রান্ত বাছুরের নাভি বা অস্থিসন্ধির ক্ষত থেকে নমুনা সংগ্রহ করে স্টেইন কালচারের (Stain Culture) মাধ্যমে এ রোগের সুনির্দিষ্ট জীবাণু পৃথক ও শণাক্ত করে।

চিকিৎসা

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। যেমন–

- ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ড্রেসিং (Dressing) করতে হবে।

চিকিৎসার জন্য পেনিসিলিন বা অন্য কোনো উঁচ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক অথবা সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

- পেনিসিলিন বা অন্য কোনো উঁচ ক্ষমতাসম্পন্ন (Broad Spectrum) অ্যান্টিবায়োটিক অথবা সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।
- অস্থিসন্ধি বা গিটের ব্যাথার জন্য অ্যাসপিরিন বা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাওয়ানো যায়।
- অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নাভির ক্ষত পরিষ্কার করা যায়।

রোগপ্রতিরোধ

এটি এমন একটি রোগ যা পশুর মালিক বা পালনকারী কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করলে প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাছাড়া নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যাবে। যেমন–

- স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।
- জন্মের পর বাচ্চার নাভিতে টিঙ্কচার আয়োডিন বা টিঙ্কচার বেনজিন লাগাতে হবে।
- গাভীর গর্ভফুল যেন বাছুরের সংস্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- গাভী যাতে বাছুরের নাভি না চাটতে পারে তাই গাভীর মুখে মুখবন্ধনি বা ঠুসি পড়িয়ে দিতে হবে।

বাছুরের ডিপথেরিয়া রোগ (Calf Diptheria)

স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংস এবং গলবিল বা ফ্যারিংসের প্রদাহকে ডিপথেরিয়া বলে।

বাছুরের ডিপথেরিয়া একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংস (Larynx) এবং গলবিল বা ফ্যারিংসের (Pharynx) প্রদাহকে ডিপথেরিয়া বলে। এটি প্রধানত অল্প বয়স্ক বাছুরে হয়। অনেক সময় জন্মের তৃতীয় দিন থেকে দেখা দিতে পারে। এতে স্বরযন্ত্র ও গলবিলের মিউকোসার উপর একটি পচনশীল বা নেক্রোটিক (Necrotic) আবরণী পড়ে। ফলে লুমেন ছোট হয়ে আসে এবং শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। চিকিৎসা না করলে ২–৭ দিনের মধ্যে বাছুর মারা যেতে পারে। অনেক সময় জীবাণু ব্রঙ্কাস (Bronchus) ও ফুসফুসে গিয়ে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া (Bronchopneumonia) এবং টক্সিমিয়া (Toxemia) বা রক্তদুষ্টি সৃষ্টি করতে পারে। ফলে বাছুর মারা যেতে পারে।

রোগের কারণ

Spherophorus necrophorus or Fusiformis necrophorus (স্ফোরোফোরাস নেক্রোফোরাস বা ফিউসিফরমিস নেক্রোফোরাস) নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বাছুরে ডিপথেরিয়া রোগ হয়। কিন্তু, মানুষের ডিপথেরিয়া হয় *Corynebacterium diptheri (করাইনেব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি)* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষত দেখতে প্রায় একই রকম।

Spherophorus necrophorus ev *Fusiformis necrophorus* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বাছুরে ডিপথেরিয়া রোগ হয়।

রোগলক্ষণ

বাছুরের ডিপথেরিয়া রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন–

জ্বরের সঙ্গে ব্যাথাযুক্ত কাশি, লালা ও শে-স্মা ঝরা, শ্বাসকষ্ট, দুর্গন্ধ, গলবিল ফোলা ইত্যাদি ডিপথেরিয়ার লক্ষণ।

- ৩৯.৫°–৪১.১° সে. (১০৩°–১০৬° ফা.) জ্বর হয়।
- জ্বরের সঙ্গে ব্যাথাযুক্ত কাশি হয়, মুখ দিয়ে লালা বের হয় ও নাক দিয়ে শে-স্মা পড়ে।
- অস্থিরতা দেখা দেয় ।
- শ্বাসকষ্ট হয় এবং নাক ও মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়।
- বাইরে থেকে গলবিল ফোলা দেখা যেতে পারে যা আঙ্গুল দিয়ে টিপলে বাছুর ব্যাথ্যা পায়।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে বাছুরের ডিপথেরিয়া রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন–

- মুখের ভিতর নেক্রোটিক বা পচনশীল ক্ষত দেখে এবং বিশ্রী গন্ধ শুঁকে কিছুটা অনুমান করা যায়।
- আক্রান্ত ক্ষত থেকে স্মেয়ার (Smear) নিয়ে স্টেইন করে জীবাণু দেখা যায়।
- কালচার করা যায়।

চিকিৎসা

সোডিয়াম সালফাডিমিডিন, সালফাপাইরিডিন, সালফামেথাজিন প্রভৃতি সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধের যে কোনো একটি নির্ধারিত মাত্রায় ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এছাড়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, সব ক্ষেত্রেই ওষুধের পুরো কোর্স শেষ করতে হবে।

রোগপ্রতিরোধ

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বাছুর পালন করে ডিপথেরিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বাছুর পালন করা।
- পশুর ঘর নিয়মিত জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ বাছুরে রোগসৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার বৈজ্ঞানিক নামের একটি তালিকা তৈরি করুন।* (বি.দ্র.ঃ বৈজ্ঞানিক নাম সবসময় ইংরেজিতে লিখবেন এবং লেখার নিচে দাগ দিবেন। অর্থাৎ underline করবেন। যেমন– Escherichia coli)।

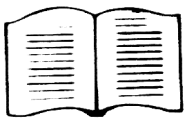

সারমর্ম ঃ বাছুর বহু ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে সব রোগই বাছুরের মৃত্যুর কারণ হয় না। বাছুরের বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মধ্যে কলিব্যাসিলোসিস, সালমোনেলোসিস, বাদলা, নাভেল বা জয়েন্ট ইল, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি প্রধান। কলিব্যাসিলোসিস, সালমোনেলোসিস, নাভেল ইল, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি সাধারণত অল্প বয়স্ক বাছুরকে আক্রান্ত করে। আর বাদলায় আক্রান্ত হয় বয়স্ক বাছুর। রোগের ইতিহাস, লক্ষণ প্রভৃতি জেনে রোগ নির্ণয় করতে হয় এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়। খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং টিকাদানের মাধ্যমে বাছুরের অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বাছুরের ডিপথেরিয়া রোগের জন্য দায়ী কোন্‌টি?

i) *Spherophorus necrophorus*
ii) *Fusiformes necrophorus*
iii) *Corynebacterium diptheri*
iv) i ও ii এ উল্লেখিত জীবাণুগুলো

খ. *Streptococcus pyogenes* কোন্ রোগ সৃষ্টি করে?

i) নাভেল ইল
ii) সালমোনেলোসিস
iii) কলিব্যাসিলোসিস
iv) বাদলা

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ডিপথেরিয়া রোগে বাছুরের ৩৯°–৪২° সে, জ্বর হতে পারে।
খ. নাভেল ইল রোগে গিট ফুলে না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. নাভেল ইল রোগের জীবাণু মস্তিষ্কে _____ সৃষ্টি করতে পারে।
খ. অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নাভির থথথথ পরিষ্কার করা যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক) নাভিপ্রদাহকে কী বলে?
খ) বাছুরের ডিপথেরিয়া এবং মানুষের ডিপথেরিয়া রোগের মধ্যে মিল কোথায়?

পাঠ ৩.২ বাদলা রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাদলা রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- বাদলা রোগের কারণ উলে-খ করতে পারবেন।
- বাদলা রোগের বিস্তৃতি, সংক্রমণ, বিকাশ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাদলা রোগ নির্ণয়, এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

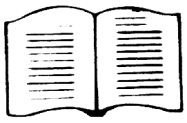

বাদলা রোগ কী?

বাদলা রোগ বাড়ন্ত বয়সের রোমন্থক পশুর একটি তীব্র প্রকৃতির ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। এটি মাটিবাহিত রোগ, তবে ছোঁয়াছে নয়। এ রোগে প্রধানত পশুর পা আক্রান্ত হয় ও আক্রান্ত স্থান কালো হয়ে যায়। তাই একে ইংরেজিতে ব-্যাক লেগ (Black Leg) বলে। এছাড়াও এ রোগকে ব-্যাক কোয়ার্টার (Black Quarter), কোয়ার্টার ইভিল (Quarter Evil) বা কোয়ার্টার ইল (Quarter Ill) নামে অভিহিত করা হয়। এ রোগটি সাধারণত বর্ষাকালে হয় বলে বাংলাদেশে এটিকে বাদলা রোগ বলে। প্রধানত বাড়ন্ত বয়সের গরু ও ভেড়াই এতে বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পশুর সঞ্চালক পেশিতে (Skeletal Muscle) পচনশীল (Necrotizing) বা গ্যাংগ্রিনাস (Gangrenous) প্রকৃতির প্রদাহের (Inflammation) সৃষ্টি হয়। এ স্থান হতে জীবাণুর বিষ রক্তে মিশে মারাত্মক ধরনের টক্সিমিয়ার (Toxemia) সৃষ্টি করে। ফলে অধিকাংশ পশু মারা যায়। ক্ষতস্থানে গ্যাস সৃষ্টি হয়, যা টিপলে পচ্ পচ্, ভজ্ ভজ্, কর্ কর্ বা পুর পুর শব্দ অনুভূত হয়।

বাদলা রোগ বাড়ন্ত বয়সের রোমন্থক পশুর একটি তীব্র প্রকৃতির ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ।

রোগের কারণ

Clostridium Chauvoie (ক্লসট্রিডিয়াম চোভিয়াই) নামক এক ধরনের বড় আকৃতির গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ।

রোগের বিস্ তি ও সংক্রমণ

সাধারনত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গর€ এ রোগে বেশি

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রোমন্থক পশুতে বাদলা রোগ দেখা যায়। সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গর€ এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশে এটি প্রধানত গরুর রোগ হিসেবেই চিহ্নিত। সাধারণত বাড়ন্ত বয়সের মোটাতাজা পশুই বেশি আক্রান্ত হয়। এ রোগ মাটিবাহিত অর্থাৎ মাটি এ রোগের জীবাণুর আধার। রোগজীবাণু দ্বারা দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে গরুতে এ রোগ সংক্রমিত হয়। আর ভেড়াতে লেজকাটা, খোঁজা করা, লোম কাটা, প্রসবকালীন ক্ষত প্রভৃতির মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করে।

রোগের বিকাশ

স্পোর (Spore) অবস্থায় এ রোগের জীবাণু পশুদেহে সংক্রমিত হয়। অন্তের নলাকার গ্রন্থিতে (Intestinal Crypts) বাতাসবিহীন অবস্থায় (Anaerobic Conditon) পচনশীল পদার্থের উপস্থিতিতে এ জীবাণু সোতার থেকে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়ায় রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এ জীবাণু রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে। যেহেতু এ জীবাণু পুরু মাংসপেশির প্রতি আসক্ত তাই পাছা, পা, ঘাড় ও স্কন্ধের পেশিতে অবস্থান নেয়। মাংসে ল্যাকটিক অ্যাসিড (Lactic Acid) বা অন্য কোনো কারণে যখন বাতাসবিহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন এ ব্যাকটেরিয়াগুলো দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে টক্সিন বা বিষ নিঃসরণ করে। এ বিষ স্থানীয়ভাবে মাংসপেশির মৃত্যু ঘটায়, সেগুলো ছিড়ে যায় এবং সিরোহিমোরেজিক প্রদাহের (Sero-haemorhagic) সৃষ্টি হয়। সেখানে মাংসের গ্লুকোজের গাঁজন বা

বাদলা রোগে টক্সিমিয়ার কারণে পশু মারা যায়।

ফারমেন্টেশনের (Fermentation) ফলে অ্যাসিড ও গ্যাসের সৃষ্টি হয়। কিছু টক্সিন রক্তে মিশে শরীরের বিভিন্ন অংশে চলে যায় এবং টক্সিমিয়ার সৃষ্টি করে যার ফলে অধিকাংশ পশু মারা যায়।

রোগের লক্ষণ

আক্রান্ত পশুতে অতিতীব্র এবং তীব্র প্রকৃতির রোগ হতে পারে।

আক্রান্ত পশুতে অতিতীব্র (Peracute) এবং তীব্র (Acute) প্রকৃতির রোগ হতে পারে। অতিতীব্র প্রকৃতির রোগে–

অতিতীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে পড়ে মারা যায়।

- আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে পড়ে মারা যায়। তবে, অনেক সময় পশু ১–২ ঘন্টা বাঁচতে পারে।
- পশু কিছু খাবে না।
- দেহে ৪০°–৪১.৭° সে. (১০৪°–১০৭° ফা.) জ্বর থাকবে।
- লোম খাড়া হবে।
- অবসাদগ্রস্থ দেখা যাবে।
- পেটে গ্যাস জমবে।
- মুখবন্ধনি বা মাজল (Muzzle) শুষ্ক থাকবে।
- চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়তে পারে।
- পিঠ কুঁজো হবে।
- হাঁটতে চাবে না এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে।

তীব্র প্রকৃতির রোগে মাংসপেশি আক্রান্ত হওয়ায় পশু হাঁটতে পারবে না খুঁড়িয়ে হাঁটবে। এটি রোগ শণাক্তকারী

তীব্র প্রকৃতির রোগে–

- অতিতীব্র প্রকৃতির রোগের লক্ষণ ছাড়াও মাংসপেশি আক্রান্ত হওয়ায় পশু হাঁটতে পারবে না, খুঁড়িয়ে হাঁটবে। এটি এ রোগের কার্ডিনাল (Cardinal) বা রোগ শণাক্তকারী চিহ্ন।
- আক্রান্ত মাংসপেশি স্ফীত, গরম ও ব্যাথাপূর্ণ হবে।
- আক্রান্ত এ ফোলা মাংসপেশি টিপলে পচ্ পচ্, ভজ্ ভজ্ বা পুরপুর শব্দ অনুভূত হবে।
- শেষ অবস্থায় এ ফোলা মাংসপেশি ঠান্ডা ও ব্যাথাহীন হয় এবং পশু এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে উঠতে পারে না।
- লক্ষণ প্রকাশের ১৮–৭২ ঘন্টার মধ্যে পশুর মৃত্যু ঘটে।
- মৃত্যুর প র্বে দেহের তাপ হ্রাস পায়।

রোগ নির্ণয়

রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস এবং বৈশিষ্টপ র্ণ লক্ষণ থেকে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

- রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস অর্থাৎ প্রধানত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবান গরু এবং বৈশিষ্টপ র্ণ লক্ষণ, যেমন– জ্বর, খোঁড়ানো ও আক্রান্ত পেশি টিপলে বৈশিষ্ট্যপ র্ণ শব্দ অনুভূত হওয়া ইত্যাদি থেকে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত স্থানের পেশি সুচ দিয়ে ছিদ্র করে সেখানকার তরল অংশ (ফ্লুইড) নিয়ে স্মিয়ার গ্রামস স্টেইন করে গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া শণাক্ত করা যায়। আবার আক্রান্ত স্থানের ফ্লুইড বা পেশির টুকরো বাতাসবিহীন কালচার মিডিয়ায় কালচার করে জৈবরাসায়নিক (Biochemical) পরীক্ষার মাধ্যমে জীবাণু শণাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা

লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথে চিকিৎসা করতে হবে। বিলম্বে করলে ওষুধে কাজ হবে না।

- লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথে এ রোগের চিকিৎসা করতে হবে। বিলম্বে করলে ওষুধে কাজ হবে না।
- আক্রান্ত পশুর শিরা বা ত্বকের নিচে ১০০–২০০ মি.লি. হিসেবে অ্যান্টিব-্যাক লেগ সিরাম ইনজেকশন করতে হবে।
- অ্যান্টিসিরাম প্রয়োগ করার পর বা না পাওয়া গেলে নিম্নের যে কোনো একটি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যাবে। যেমন–

  ক. প্রথমে ক্রিস্টালিন পেনিসিলিন ১০–২০ লাখ ইউনিট শিরায় মধ্যে ইনজেকশন করলে দ্রুত কাজ আরম্ভ হয়। এরপর ১০–২০ লাখ ইউনিট প্রোকেইন পেনিসিলিনের অর্ধেক আক্রান্ত পেশিতে ও বাকি অর্ধেক সুস্থ মাংসের মধ্যে দৈনিক হিসেবে ৫-৭ দিন ইনজেকশন করতে হবে।

  খ. প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩–৫ গ্রাম হিসেবে টেট্রাসাইক্লিন প্রত্যেহ একবার করে ৫ দিন মাংসপেশিতে ইনজেকশন করলে সুফল পাওয়া যায়।

- জ্বর এবং ব্যাথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল বা নোভালজিন ট্যাবলেট খাওয়ানো যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ

টিকা প্রদান এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে বাদলা রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। তিন মাসের বেশি বয়সের গর€র ত্বকের নিচে ৫ মি.লি. মাত্রায় ও ভেড়ায় ২ মি.লি. মাত্রায় ব্ল্যাক কোয়ার্টার ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। ৬ মাস অন্তর এ টিকা প্রয়োগ করা উচিত। এছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যেমন– আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে পৃথক করে চিকিৎসা করতে হবে। আর মৃত পশুকে সঠিক নিয়মে মাটির নিচে পুতে রাখতে হবে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *অতিতীব্র ও তীব্র প্রকৃতির বাদলা রোগের লক্ষণের মধ্যকার পার্থক্যগুলো ছক আকারে লিপিবদ্ধ করুন।*

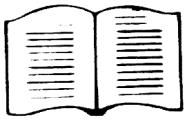

সারমর্ম ঃ বাদলা ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গর€র একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। *Clostridium chauvoei* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ। এ রোগের জীবাণু দেহের পুরু মাংসপেশিকে আক্রান্ত করে ও মাংসপেশির মৃত্যু ঘটায়। আক্রান্ত মাংসপেশিতে অ্যাসিড ও গ্যাসের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত স্থান কালো হয়ে যায়। টিপলে পুর পুর, পচ্ পচ্ বা ভজ্ ভজ্ শব্দ হয়। রোগটি অতিতীব্র ও তীব্র আকারে দেখা দিতে পারে। অতিতীব্র রোগে টক্সিমিয়ার কারণে পশু মারা যায়। লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে পেনিসিলিন বা টেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশন প্রয়োগে আক্রান্ত পশুকে সাড়িয়ে তোলা যায়। রোগ প্রতিরোধের জন্য ৬ মাস অন্তর সুস্থ পশুকে টিকা দিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বাদলা রোগ কোন্ ধরনের সংক্রামক রোগ?

i) মাটিবাহিত
ii) পানিবাহিত
iii) মাটি ও পানিবাহিত
iv) বায়ুবাহিত

খ. কেমন ধরনের গরু বাদলা রোগে আক্রান্ত হয়?

i) বাড়ন্ত বয়সের রুগ্ন গরু
ii) বৃদ্ধ বয়সের গরু
iii) বাড়ন্ত বয়সের মোটাতাজা গর€
iv) বাচ্চা বয়সের গরু

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বাদলা রোগে সঞ্চালক পেশিতে গ্যাংগ্রিনাস প্রকৃতির প্রদাহের সৃষ্টি হয়।
খ. বাদলা রোগের জীবাণু বাইপোলার গ্রাম নেগেটিভ।

৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. *Clostridium* _____ নামক ব্যাকটেরিয়া বাদলা রোগের জীবাণু।
খ. মাংসপেশিতে _____ অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বাদলা রোগের কার্ডিনাল চিহ্ন কী?
খ. বাদলা রোগে পশু কেন মারা যায়?

পাঠ ৩.৩ গলাফোলা রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গলাফোলা রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- গলাফোলা রোগের জীবাণুর বিভিন্ন সেরোটাইপের নাম লিখতে পারবেন।
- গলাফোলা রোগ সংক্রমণ, এর বিকাশ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিসহ গলাফোলা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবেন।

গলাফোলা রোগ কী?

পৃথিবীতে গরু ও মহিষের যতগুলো মারাত্মক সংক্রামক রোগ রয়েছে গলাফোলা তাদের মধ্যে অন্যতম। রক্তদুষ্টি বা সেপ্টিসেমিয়া, জ্বর, গলা ও গলকম্বল পানি বা ইডিমার (Ocdema) জন্য ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া, নাকমুখ দিয়ে পানির মতো তরল পদার্থ বের হওয়া এবং উচ্চ মৃত্যুহার এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রক্তদুষ্টি ও দেহের সকল সিরাম ও মিউকাস পর্দার নিচে অবস্থিত কৈশিকনালিসম হ (Capillarices) থেকে রক্তপাত হয় বলে একে হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া (Haemorrhagic Septicemia) বলে। এ রোগে গলা ও গলকম্বল ফুলে যায় বলে স্থানীয় ভাষায় একে গলাফোলা, ঘটু, গলাবেরা বা গলাফাঁস নামে ডাকা হয়। এছাড়াও এ রোগকে বারবোন (Burobone) বলা হয়। বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত এবং শীতকালীন বৃষ্টির সময় এ রোগের প্রাদুর্ভাব সাধারণত মড়ক আকারে দেখা দেয়। তবে, অন্যান্য সময়ও এ রোগ হতে পারে।

পৃথিবীতে গর€ ও মহিষের যতগুলো মারাত্মক সংক্রামক রোগ রয়েছে গলাফোলা তাদের মধ্যে অন্যতম।

রোগের কারণ

Pasteurella multocida (পাস্চুরেলা মালটুসিডা) নামক গ্রাম নেগেটিভ, বাইপোলার ও ক্ষুদ্র কক্কোয়েড (Coccoid) আকৃতির ব্যাকটেরিয়ার কয়েক প্রকার সেরোটাইপ এ রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। যেমন–

১. *Pasteurella multocida* serotype 1 (Roberts)|
2. *Pasteurella multocida* serotype 6 B (Namicko) I 6 E (Murata)|
3. *Pasteurella mulltocida* serotype E (Carter)|

Pasteurella multocida ব্যাকটেরিয়ার কয়েক প্রকার সিরোটাইপ গলাফোলা রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

রোগ সংক্রমণ

অনেক সুস্থ গরু ও মহিষের ন্যাসোফ্যারিংসে (Naso-pharyx) *Pasteurella multocida* জীবাণু বাস করে। তবে, এসব পশু ও জীবাণুর মধ্যে একটা সমতা (Equillibrium) থাকায় এরা রোগে আক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ রোগজীবাণু যতটুকু ক্ষতিসাধন করে, পশুদেহ তা পুষিয়ে নেয়। কিন্তু এসব পশুর দেহে কোনো কারণে স্ট্রেস (Stress) বা চাপ পড়লে জীবাণু দ্রুত বংশবিস্তার করে এবং রক্তে প্রথমে ব্যাকটেরিয়া ও পরে এন্ডোটক্সিন সৃষ্টি করে সেপ্টিসেমিয়া ঘটায়। এছাড়াও নিম্নলিখিতভাবে এ রোগটি সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

অনেক সুস্থ গর€ ও মহিষের ন্যাসোফ্যারিংসে জীবাণু বাস করে। তবে, এসব পশু ও জীবাণুর মধ্যে একটা সমতা থাকায় এরা রোগে আক্রান্ত হয় না।

- ◆ রোগাক্রান্ত পশুর লালা, নাক নিঃসৃত পদার্থ ও মলম ত্রাদির দ্বারা দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে (তবে, অবশ্যই ২৪ ঘন্টার মধ্যে। কারণ, এরপর জীবাণু মারা যায়)।
- ◆ ব্যাকটেরিমিয়া অবস্থায় রক্তচোষক কীটপতঙ্গ ও আটালির মাধ্যমে।

রোগের বিকাশ

স্ট্রেস অবস্থায় জীবাণু ন্যাসোফ্যারিংস থেকে ফুসফুসে গিয়ে বংশবিস্তার করে এবং রক্তে মিশে। ফলে নিউমোনিক পাস্চুরেলোসিসের (Pneumonic Pasteurellosis) সৃষ্টি হয়। এছাড়াও রোগাক্রান্ত পশুর লালা, নাক নিঃসৃত পদার্থ, মল ইত্যাদি দ্বারা দুষিত খাদ্য ও পানির সাহায্যে দেহে প্রবেশ করে রক্তে মিশে ব্যাকটেরিমিয়ার সৃষ্টি করে। রক্তে জীবাণু মরে গিয়ে যে এন্ডোটক্সিনের সৃষ্টি করে তার কারণেই

Pasteurella multocida নিউমোনিক এবং ইন্টেস্টিনাল পাস্তুরেলোসিসের সৃষ্টি করে।

সেপ্টিসেমিয়া হয়। এ এন্ডোটক্সিন রক্তের কৈশিকনালি ও অন্যান্য টিস্যু বিনষ্ট করে। ফলে দেহে হিস্টামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও ইডিমা হয় বা পানি জমে। সে কারণে এ রোগে আক্রান্ত পশুর গলা ইডিমায় ফুলে যায় ও রক্তে সেপ্টিসেমিয়া হয়। কখনও কখনও এ রোগে পাকান্ত প্রদাহের সৃষ্টি হয়। ফলে ডায়রিয়া দেখা দেয়। এ প্রকৃতির রোগকে ইনটেস্টাইনাল পাস্চুরেলোসিস (Intestinal Pastenurellosis) বলে।

রোগের লক্ষণ

গলাফোলা রোগ অতিতীব্র ও তীব্র দুপ্রকৃতির হতে পারে।

গলাফোলা রোগ অতিতীব্র ও তীব্র দুপ্রকৃতির হতে পারে।

অতিতীব্র প্রকৃতির রোগ ঃ এ প্রকৃতির রোগে তড়কা রোগের মতো পশু হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে মারা যেতে পারে। কোনো কোনো পশু ৬–১২ ঘন্টা পর মারা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জ্বর, ক্ষুধামন্দা, নাক ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ পড়া, নিস্তেজ হওয়া, পাতলা পায়খানা করা প্রভৃতি দেখা যায়। অবশেষে পশু মারা যায়।

তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশুতে ৪০.৬°–৪১.৭° সে. জ্বর ওঠে।

তীব্রপ্রকৃতির রোগ ঃ তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশুতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন–

- দেহে ৪০.৬°–৪১.৭° সে. (১০৫°–১০৭° ফা.) জ্বর ওঠে।
- পশু ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ঝিম মেরে দাড়িয়ে বা শুয়ে থাকে।
- নাক দিয়ে পানি ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ পড়ে।
- ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
- এভাবে ২৪ ঘন্টা পার হলেই গলার নিচে ফুলতে থাকে। এ ফোলা ক্রমশ বুক এবং পেট পর্যন্ত যেতে পারে। কখনও কখনও চোয়াল ও কানের অংশও ফুলতে পারে।
- অনেক সময় পশুর জিহ্বা ফুলে যায় এবং তা লাল হয়। এ সময় এরা মুখ হা করে রাখে বা জিহ্বা বের হয়ে পড়ে। এসব ফোলা জায়গা শক্ত ও গরম থাকে, টিপলে পশু ব্যাথা পায়, সুচ দিয়ে ছিদ্র করলে হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ বের হয়।
- গলার এ স্ফীত অংশ স্বরযন্ত্র ও গলবিলের উপর চাপ দেয় বলে পশুর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তাই মুখ হা করে শ্বাস নেয়। শ্বাস ত্যাগের সময় গলার ভেতর ঘড় ঘড় শব্দ হয়, যা বেশ দ র থেকে শোনা যায়।
- পশুতে ফ্রাব্রিনাস ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার (Fibrinous Bronchopneumonia) সৃষ্টি হয়।

চিত্র ২৯ ঃ গলাফোলা রোগে আক্রান্ত গরুর ফুসফুসে ফ্রাব্রিনাস ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার চিহ্ন

- পশু ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে।
- জ্বর কমতে থাকে।
- যেসব পশুর অন্ প্রদাহ হয় তাদের পেটে ব্যথা হয় ও রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা করে।
- শেষের দিকে পশু শুয়ে পড়ে।
- নাক এবং মুখ দিয়ে পানির মতো তরল পদার্থ বের হয়।
- তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে ও পশু মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে গর€মহিষের গলাফোলা রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন–

- হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন, বর্ষা ও শীতকালীন বৃষ্টি, একটানা পরিশ্রম করানোর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, যেমন– জ্বর, লালা ক্ষরণ, গলায় গরম ব্যাথাযুক্ত পানিপ র্ণ স্ফীতি ও শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি।
- মৃত পশুর শরীরের ইডিমাযুক্ত অংশগুলো কাটলে হলুদ বর্ণের জেলির মতো তরল পদার্থ পাওয়া যায়। এ অংশের ত্বক লাল হতে পারে এবং অধঃত্বকে বিন্দু বিন্দু ও ইকাইমোটিক প্রকৃতির রক্তপাত দেখা যায়। ফুসফুস ও লসিকাগ্রন্থিতে ইডিমা ও পাকান্ প্রদাহ থাকে।
- সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নিরূপণের জন্য মৃত পশুর হৃৎপিন্ডের রক্ত, ফুসফুস ও প্লীহার নমুনা এবং জীবিত রোগাক্রান্ পশুর লালা ও রক্ত গ্রামস স্টেইন ও মিথাইলিন ব্লু দিয়ে স্টেইন করে গ্রাম নেগেটিভ, বাইপোলার দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া শণাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

রোগলক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

আক্রান্ পশুর চিকিৎসা বিলম্বে হলে কোনো ওষুধে সুফল পাওয়া যায় না। তাই রোগলক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। এ রোগের চিকিৎসার জন্য সালফোনেমাইড, যেমন– সালফাডিমিডিন, ট্রাইমেথোপ্রিম-মেথোক্সাজল অথবা অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন– অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

রোগপ্রতিরোধ

গলাফোলা রোগ নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কারণ, এ রোগের জীবাণু স্বাভাবিক অবস্থায় পশুর দেহে থাকে।

এ রোগ নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কারণ, এ রোগের জীবাণু স্বাভাবিক অবস্থায় পশুর দেহে থাকে। তবে নিম্নলিখিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

- অসুস্থ পশুকে সুস্থ পশু থেকে পৃথক করে চিকিৎসা করাতে হবে।
- অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে যেগুলো ছিল তাদেরকে অ্যান্টিসিরাম বা দীর্ঘস্থায়ী টেট্রাসাইক্লিন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।
- অন্যান্য পশুকে টিকা দিতে হবে।
- মড়কের সময় পশুর চলাচল নিয়ন্ ণ করতে হবে।
- পশুকে একস্থান থেকে অন্যস্থান বা একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরের সময় পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতে হবে।
- হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পশুর পরিচর্যার ব্যবস্থা সেভাবে করতে হয়।

- শুষ্ক ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পশু পালন করতে হবে।
- মৃত পশুকে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে বা পোড়াতে হবে। মাঠে ফেলে দেয়া চলবে না বা মুচি দিয়ে চামড়া ছাড়ানো উচিত হবে না।
- বছরে কমপক্ষে একবার গরুমহিষকে গলাফোলা রোগের টিকা নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ নিউমোনিক পাস্চুরেলোসিস ও ইনটেসস্টাইনাল পাস্চুরেলোসিসের মধ্যকার পার্থক্য লিপিবদ্ধ করুন।*

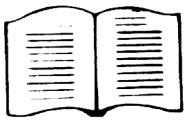

সারমর্ম ঃ গর€ ও মহিষের মারাত্তক রোগের মধ্যে গলাফোলা বা হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া অন্যতম। গলা ও গলকম্বল ফোলা এবং সেপ্টিসেমিয়ার কারণে এ রোগের এ নামকরণ। গলাফোলা রোগ *Pasteurella multocida* নামক ব্যাকটেরিয়ার কয়েক প্রকার সেরোটাইপ দ্বারা সংঘটিত হয়। এ রোগ অতিতীব্র এবং তীব্র প্রকৃতির হতে পারে। সেপ্টিসেমিয়া, জ্বর, গলা ও গলকম্বল পানি বা ইডিমার জন্য ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া, নাকমুখ দিয়ে পানির মতো তরল পদার্থ বের হওয়া এবং উচ্চ মৃত্যুহার এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্রুত চিকিৎসা না করলে আক্রান্ত পশুকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ রোগের চিকিৎসার জন্য সালফোনেমাইড বা অক্সিটেট্রাসাইক্লিনজাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। রোগপ্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থায় পশু পালন অপরিহার্য। তাছাড়া সুস্থ পশুকে বছরে কমপক্ষে একবার গলাফোলা রোগের টিকা দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. গলাফোলা রোগে গলা কেন ফুলে?

i) ইডিমার জন্য
ii) পুঁজ জমার জন্য
iii) গ্যাসের জন্য
iv) কোনোটিই নয়

খ. *Pasteurella multocida* serotype E এর নাম কী?

i) Roberts
ii) Carter
iii) Murata
iv) Namieko

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. গলাফোলা রোগে ৪০.৬°–৪১.৭° সে. জ্বর উঠে।
খ. গলাফোলা রোগের টিকা বছরে দুবার দিতে হয়।

৩। শূণ্যস্থান পুরণ করুন।

ক. গলার স্ফীতি অংশ _____ ও গলবিলের উপর চাপ দেয়।
খ. রক্তে *Pasteurella Multocida* মরে _____ সৃষ্টি করে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. গলাফোলা রোগে কী কী প্রকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়?
খ. পশুর ইডিমাযুক্ত অংশগুলো কাটলে কেমন পদার্থ বের হয়?

পাঠ ৩.৪ তড়কা রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- তড়কা রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- তড়কা রোগের কারণ, বিস্তার, সংক্রমণ ও বিকাশ লিখতে পারবেন।
- তড়কা রোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বর্ণনা করতে পারবেন।
- তড়কা রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

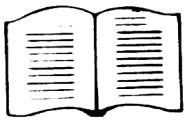

তড়কা রোগ কী?

> তড়কা পশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত অতিতীব্র প্রকৃতির রোগ। সেপ্টিসেমিয়া ও হঠাৎ মৃত্যু এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তড়কা রোগ পশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি অতিতীব্র প্রকৃতির রোগ। সেপ্টিসেমিয়া ও হঠাৎ মৃত্যু এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে মানুষসহ যে কোনো ধরনের পশু আক্রান্ত হতে পারে। ইংরেজিতে এ রোগকে অ্যানথ্রাক্স (Anthrax) বলে। আক্রান্ত পশু হঠাৎ মারা যেতে পারে। মৃত্যুর পর মৃতুদেহে দ্রুত পচন ধরে এবং পেট ফুলতে থাকে। নাক, মুখ, প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কালো বর্ণের (আলকাতরার মতো) রক্ত বের হতে থাকে। মৃতদেহে কাঠিন্য আসে না বা রাইগর মর্টিস (Rigor Mortis) হয় না। এটি এ রোগের জন্য রোগলক্ষণিক ক্ষত বা প্যাথোগনোমনিক লেশন (Pathognomonic Lesion)। ময়না তদন্তে প্লীহা অত্যন্ত স্ফীত, নরম এবং কয়লার মতো দেখায়। এজন্য অনেকে এ রোগকে চার্বন (Charbon) বা স্পোনিক ফিভার (Splenic Fever) বলে থাকেন।

রোগের কারণ

> *Bacillus anthracis* নামক এক ধরনের গ্রাম পজেটিভ দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া তড়কা রোগের জন্য দায়ী।

Bacillus anthracis (ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস) নামক এক ধরনের গ্রাম পজেটিভ দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া তড়কা রোগের জন্য দায়ী। এ ব্যাকটেরিয়ার দেহে আবরণী বা ক্যাপসুল আছে। ক্যাপসুল ও জীবাণুর মধ্যে একটি স্পোর থাকে। এ স্পোর জীবাণুনাশক ওষুধ বা সাধারণ তাপে নষ্ট হয় না। স্পোর মাটিতে ৩০–৪০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। এ সময়ের মধ্যে কোনো পশু সেখানে চলাচল করলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ জীবাণু যে বিষ নিঃসৃত করে তার তিনটি অংশ রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ–

ক. উৎপাদক ১ ঃ এটি পানি জমায় বা ইডিমা সৃষ্টি করে।
খ. উৎপাদক ২ ঃ এটি জীবাণুকে পোষকের দেহের কলা বা টিস্যুভেদ করতে সাহায্য করে।
গ. উৎপাদক ৩ ঃ এটি প্রাণসংহারী বা সংহারকারক।

রোগের বিস্তার

> বিশ্বের প্রায় সব দেশে মানুষসহ পশুর তড়কা রোগ হয়।

বিশ্বের প্রায় সব দেশে মানুষসহ পশুর এ রোগ হয়। তবে, কুকুর, বিড়াল ও আলজেরিয়ান জাতের ভেড়াতে এ রোগ হয় না। এদেশে যে কোনো রোগে মৃত পশুকে খোলা অবস্থায় ভাগাড়ে ফেলে রাখা হয়। ফলে শবাহারি পশুপাখির মাধ্যমে রোগের জীবাণু ছড়ায় এবং মাটিতে স্পোর বিস্তারলাভ করে। এমতাবস্থায় খরার পর ব্যাপক বৃষ্টিপাত হলে এবং গরম ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় এ জীবাণুর বিস্তার ঘটে। এছাড়া বন্যার পানির মাধ্যমেও এ জীবাণু ছড়াতে পারে।

রোগ সংক্রমণ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যথা–

- প্রধানত দুষিত খাদ্য ও পানি গ্রহণের মাধ্যমে।
- শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমেও স্পোর সংক্রমিত হতে পারে।

- ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে এ রোগ সংক্রমিত হয়।
- ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে রক্তচোষক কীটপতঙ্গের মাধ্যমে আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে এ জীবাণু সংক্রমিত হয়।
- আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এ রোগের মড়কের সময় আক্রান্ত পশুর মৃত্যুর ভয়ের কারণে পশু জবাই করে মাংস খায়। এক্ষেত্রে মাংস কাটার সময় মানুষে জীবাণু সংক্রমিত হয়।
- এ রোগে মৃত পশুর সংস্পর্শে মানুষের রোগ হয়। মানুষের ত্বকে এ জীবাণু ম্যালিগন্যান্ট কারবাঙ্কল (Malignant Carbuncle) রোগ সৃষ্টি করে।

রোগের বিকাশ

Bacillus anthracis জীবাণু সেপ্টিসেমিয়া ও ইডিমা সৃষ্টি করে এবং টিস্যুকে বিনষ্ট করে।

Bacillus anthracis জীবাণুর স্পোর দেহে সংক্রমিত হওয়ার পর শৈ-ষিক ঝিল্লী দিয়ে প্রবেশ করে এবং ফ্যাগোসাইটের (Phagocyte) মাধ্যমে স্থানিক লসিকাগ্রন্থিতে এসে বংশবিস্তার করে। পরবর্তীতে এরা লসিকাগ্রন্থি থেকে রক্তে পৌঁছে রক্তদুষ্টি বা সেপ্টিসেমিয়ার সৃষ্টি করে এবং দেহের প্রায় সকল টিস্যুকে আক্রান্ত করে। জীবাণু থেকে নিঃসৃত বিষ ইডিমা সৃষ্টি করে এবং টিস্যুকে বিনষ্ট করে। প্রধানত শক (Shock), তীব্র রিন্যাল অকার্যকারিতা ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যস্থতায় অন্তিম অক্সিজেন স্বল্পতায় পশুর মৃত্যু ঘটে।

রোগের লক্ষণ

রোমন্থক পশুতে এ রোগ প্রধানত দুপ্রকৃতির হয়ে থাকে। যথা–

অতি তীব্র প্রকৃতির রোগ ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশু কোনো লক্ষণ প্রকাশের প র্বেই মারা যায়। তবে ১–২ ঘন্টা বেঁচে থাকলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়। যথা–

মৃত পশুর দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথে আলকাতরার মতো কালচে রক্ত বের হয়।

- জ্বর, পেশির কম্পন, শ্বাসকষ্ট, ঝিল্লীপর্দায় রক্ত সঞ্চায়ন ইত্যাদি।
- অতঃপর অন্তিম খিঁচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পশুর মৃত্যু ঘটে।
- মৃত পশুর দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথ, যেমন– মুখ, মলদ্বার, যোনিপথ, নাসারন্দ্র প্রভৃতি দিয়ে আলকাতরার মতো কালচে রক্ত বের হয়।

তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশু প্রায় ৪৮ ঘন্টা জীবিত থাকে।

তীব্র প্রকৃতির রোগ ঃ তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশু প্রায় ৪৮ ঘন্টা জীবিত থাকে। এ সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

- ৪০°–৪১.৭° সে. জ্বর ওঠে।
- ক্ষুধামন্দা, নিস্তেজতা, পেটফাঁপা, দেহের ঝাঁকুনি, চোখের রক্তাভ পর্দা ইত্যাদি দেখা যায়।
- শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর ও দ্রুত হয় এবং হৃৎপিন্ডের গতি বৃদ্ধি পায়।
- রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়।
- অনেক সময় নাক, মুখ, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়।
- দুগ্ধবতী গাভী দুধ দেয়া কমিয়ে দেয় এবং দুধ হলুদ ও রক্তমিশ্রিত হয়।
- পাকান্ত আক্রান্তের ফলে ডায়রিয়া ও রক্ত আমাশয় দেখা দেয়।
- গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত হয়।
- আক্রান্ত গরু একদিনের বেশি জীবিত থাকলে জিহ্বা, গলা, বুক, নাভি ও যোনিদ্বার ইডিমার কারণে স্ফীত দেখায়।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নিরূপণ করা যায়। যথা–

- গবাদিপশুর হঠাৎ মৃত্যুর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ পরীক্ষা করে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

গবাদি পশুর হঠাৎ মৃত্যুর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ পরীক্ষা করে তড়কা রোগ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

সুনির্দিষ্টভাবে এ রোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত পশুর কানের রক্ত ও স্থানিক ইডিমার ফ্লুইড নিতে হয়। এগুলো গ্রামস স্টেইন ও পলিক্রোম মিথাইল ব্লস্টেইন করে *Bacillus anthracis* জীবাণু শণাক্ত করা যায়।

- মৃত পশুর দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন দেখেও রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–
  - মৃত পশুর পচন দ্রুত শুরু হয় ও পেটফাঁপা থাকে।
  - দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথ দিয়ে আলকাতরার ন্যায় কালো রক্ত বের হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধে না।
  - মৃত্যুর পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কাঠিন্য আসে না বা রাইগর মরটিস হয় না।
  - সমগ্র দেহে রক্তক্ষরণ, স্ফীত লসিকাগ্রন্থি, অন্ত প্রদাহ ও গ্যাসীয় পচন হয়।
  - প্লীহা স্ফীত থাকে এবং নরম ও কালো দেখায়।
- অ্যাসকলি প্রিসিপিটেশন টেস্টের (Ascoli Pricipitation Test) মাধ্যমেও এ রোগের নিশ্চিত পরীক্ষা করা যায়।

চিকিৎসা

অ্যান্টিসিরাম, অ্যান্টিবায়োটিক এবং সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা সম্ভব।

অ্যান্টিসিরাম, অ্যান্টিবায়োটিক এবং সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা সম্ভব। অ্যান্টিসিরাম দেয়ার পর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ৪/৫ দিন চিকিৎসা করতে হবে। কারণ, অ্যান্টিসিরাম শুধু জীবাণু সৃষ্ট বিষ নষ্ট করবে। কাজেই, জীবাণুকে মারার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধের ব্যবহার প্রয়োজন। অ্যান্টিসিরাম না পাওয়া গেলে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে।

রোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ ণ

আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা, সুস্থ পশুকে টিকা প্রদান এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে তড়কা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা করতে হবে। সুস্থ পশুকে টিকা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে অ্যানথ্রাক্স স্ফোর ভ্যাকসিন পাওয়া যায়। বছরে একবার নির্ধারিত মাত্রায় এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। যথা–
  - এ রোগে মৃত পশুর কোনো ময়না তদন্ত বা কাটাছেঁড়া করা যাবে না। কারণ, জীবাণু বায়ুর সংস্পর্শে আসলেই স্ফোরে পরিণত হয়। তাই মৃত পশুর দেহের সকল স্বাভাবিক ছিদ্রপথ তুলো দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এতে মরদেহ পচনের সাথে সাথে জীবাণুরও মৃত্যু ঘটবে। তাছাড়া এ রোগে মৃত পশুকে ২ মিটার গভীর গর্তে পর্যাপ্ত কলিচুন সহকারে মাটিচাপা দিতে হবে। মাটির উপরে কাঁটাজাতীয় কোনো গাছের ডাল পুতে দিতে হবে যেন সেখানে লোকজন বা পশু চলাচল না করে।
  - স্ফোর সৃষ্টির পূর্বেই মৃত পশুর গোয়াল ঘরকে গরম ১০% সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (৬০° সে.) দিয়ে ধৌত করলে জীবাণুর মৃত্যু ঘটবে। তবে স্ফোর সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে ঘন জীবাণুনাশক ওষুধ, যেমন– ৫% লাইজল বা ফরমালিন বা অন্য

কোনো কার্যকরী জীবাণুনাশক ওষুধ নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

- আক্রান্ত পশুর সংস্ফর্শের অন্যান্য সুস্থ পশুকে পৃথক করে হাইপারইমিউন সিরাম (Hyperimunune Serum) ইনজেকশন দেয়া যায়।
- পশুজাত দ্রব্য, যেমন– বোন মিল আমদানির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু একদেশ থেকে অন্যদেশে ছড়াতে পারে। সুতরাং বোন মিল আমদানির ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা প্রয়োজন।

অনুশীলন (Activity) *ঃ বাদলা, গলাফোলা ও তড়কা রোগের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো ছক আকারে লিপিবদ্ধ করুন।*

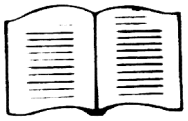

সারমর্ম ঃ তড়কা বা অ্যানথ্রাক্স রোগ পশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি অতিতীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগ। *Bacillus anthracis* নামক গ্রাম পজেটিভ দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়ার কারণে এ রোগ হয়। সেপ্টিসেমিয়া এবং হঠাৎ মৃত্যু এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে মৃত পশুর দেহে দ্রুত পচন ধরে এবং পেট ফুলতে শুরু করে। নাক, মুখ, প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে আলকাতরার মতো কালো বর্ণের রক্ত বের হতে থাকে। মৃতদেহে কাঠিন্য আসে না এবং প্লীহা অত্যন্ত স্ফীত, নরম ও কালো থাকে। অ্যান্টিসিরাম, অ্যান্টিবায়োটিক এবং সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধ দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. তড়কা রোগে পশুর স্বাভাবিক ছিদ্রপথে কেমন রক্ত বের হয়?

i) টকটকে লাল রক্ত
ii) তাজা রক্ত
iii) চকোলেট রঙের রক্ত
iv) আলকাতরার মতো কালো রক্ত

খ. *Bacillus anthracis* জীবাণুর বিষের কোন্ অংশ সংহারকারক?

i) উৎপাদক ১
ii) উৎপাদক ২
iii) উৎপাদক ৩
iv) কোনোটিই নয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. তড়কা রোগে মৃতদেহে কাঠিন্য আসে।
খ. তড়কা রোগের ব্যাকটেরিয়া, রক্তচোষক ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. তড়কা রোগ প্রধানত _____ খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।
খ. তড়কা রোগকে _____ বা স্ফোনিক ফিভার বলে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. *Bacillus anthracis* মানুষের ত্বকে কী রোগ সৃষ্টি করে?
খ. তড়কা রোগে মৃত পশুকে কীভাবে মাটিচাপা দিতে হয়?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। গবাদিপশুর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের নাম লিখুন এবং এগুলোর মধ্যে অন্তত পাঁচটি রোগের জীবাণুর নাম উল্লেখ করুন।

২। বাছুরে কেন নাভেল/জয়েন্ট ইল রোগ হয়?

৩। বাছুরের ডিপথেরিয়া রোগ কী? এ রোগের লক্ষণগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

৪। বাছুরের নাভেল ইল সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।

৫। বাদলা রোগের কারণ কী? কোন্ ধরনের পশু এতে বেশি আক্রান্ত হয়?

৬। কীভাবে বাদলা রোগ বিকাশলাভ করে?

৭। গলাফোলা রোগ কী? এ রোগের ব্যাকটেরিয়ার সেরোটাইপগুলোর নাম লিখুন।

৮। কীভাবে বাদলা রোগ নির্ণয় করা যায়?

৯। তীব্র প্রকৃতির তড়কা রোগের লক্ষণ বর্ণনা করুন।

১০। কীভাবে তড়কা রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করবেন?

উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১

১। ক. iv ১। খ. i ২। ক. মি ২। খ. মি ৩। ক. ম্যানিনজাইটস ৩। খ. ক্ষত ৪। ক. ওমফ্যালাইটিস ৪। খ. ক্ষত দেখতে প্রায় একই রকম

পাঠ ৩.২

১। ক. i ১। খ. iii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. *chauvoeর* ৩। খ. বাতাসবিহীন ৪। ক. পশু হাঁটতে পারবে না বা খুঁড়িয়ে হাঁটবে ৪। খ. টক্সিমিয়ার কারণে

পাঠ ৩.৩

১। ক. i ১। খ. ii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. স্বরযন্ত্র ৩। খ. এন্ডোটক্সিন ৪। ক. অতিতীব্র ও তীব্র প্রকৃতির ৪। খ. হলুদ বর্ণের জেলির মতো তরল পদার্থ

পাঠ ৩.৪

১। ক. iv ১। খ. iii ২। ক. মি ২। খ. স ৩। ক. দুষিত ৩। খ. চারবোন ৪। ক. ম্যালিগন্যান্ট কারবাঙ্কল ৪। খ. কলিচুন সহকারে ২ মিটার গভীর গর্তে